ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1410-1416
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.361

‘শালগিরার ডাকে’ উপন্যাসে দিকুদের আশ্রয়দাতা সাঁওতালরা: আদিবাসী ও অ-আদিবাসী মেলবন্ধন

শিবরাম হাঁসদা, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This research paper examines the role of indigenous communities, particularly the Santals, as protectors and providers of refuge to non-tribal populations in Mahasweta Devi’s novel Shalgirar Dake. While pre-Kallol Bengali fiction rarely portrayed the struggles of tribal life, Mahasweta Devi, often regarded as the “Marang Dai” (elder sister) of Adivasis, foregrounds their socio-cultural realities, resilience, and ethical values. The study highlights how Adivasi societies, despite economic hardship, maintained strong communal bonds, self-sufficient village systems, and egalitarian social structures free from rigid caste hierarchies. During the devastating Bargi invasions (1742–1751), widespread violence, plunder, and displacement forced many non-tribal (Diku) communities to flee their homes. In this context, Santal villages emerged as safe havens due to their unity, martial preparedness, and relative autonomy from feudal and colonial control. Mahasweta Devi illustrates that the Santals not only provided shelter to displaced artisans such as blacksmiths, potters, and carpenters but also integrated them into their socio-economic framework by offering land, food, and dignity. This humanitarian inclusiveness transformed Adivasi villages into self-reliant, multi-occupational communities, reducing dependence on external systems. However, the paper also critically explores the long-term consequences of this openness. The gradual infiltration of exploitative non-tribal forces, aided by internal betrayal, led to economic exploitation, imposition of taxes, and eventual marginalization of the Adivasis themselves. This shift culminated in resistance movements led by figures like Tilka Murmu against colonial and feudal oppression. Thus, the paper argues that Adivasi societies, often labeled “primitive,” were in fact deeply humane, organized, and resilient, playing a crucial role as protectors of displaced populations, while simultaneously becoming victims of systemic exploitation.

Keywords: Adivasi, Indigenous communities, Santal, Mahasweta Devi, Shalgirar Dake, Diku, Non-tribal communities, Refuge, Shelter, Bargi Raids, Social structure, Self-sufficient villages, Rebellion, Resistance

কল্লোল যুগের পূর্ববর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে আদিবাসীদের জীবনসংগ্রাম তেমনভাবে চিত্রিত না হলেও রবীন্দ্র-উত্তর যুগে যাঁদের প্রচেষ্টায় আদিবাসী জনজীবন ও সংগ্রাম বিশেষভাবে আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে, তাঁদের মধ্যে

অন্যতম হলেন আদিবাসীদের 'মারাং দাই'— অর্থাৎ বড়দিদি— মহাশ্বেতা দেবী। পিতা মনীশ ঘটকের মৃত্যুর পর ১৯৮০ সালে তিনি 'বর্তিকা' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর সম্পাদনায় 'বর্তিকা' ক্রমশ শোষিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত ও দরিদ্র আদিবাসীদের আলোকবর্তিকা হয়ে ওঠে।

মহাশ্বেতা দেবী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এক অগ্নিগর্ভ সময়ে বড়ো হয়েছেন। তিনি ব্রিটিশদের অত্যাচার, সামাজিক অবক্ষয় এবং দুর্বলের ওপর সবলের শোষণ ও নিপীড়ন প্রত্যক্ষ করেছেন। মেদিনীপুরে বসবাসকালে সেখানকার আদিবাসীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। পরবর্তীতে বাংলা, বিহার, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সঙ্গেও তাঁর পরিচয় বিস্তৃত হয় এবং তিনি ধীরে ধীরে তাদের পরিবারের 'মারাং দাই' হয়ে ওঠেন।

দীর্ঘদিন আদিবাসীদের সান্নিধ্যে থেকে তিনি তাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পাশাপাশি সমকালীন জীবনযাত্রা সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করেন। এই তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে তিনি উপলব্ধি করেন যে, পরিবারকে টিকিয়ে রাখার কঠোর সংগ্রামের মতোই নিজেদের সমাজ ও অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়েও আদিবাসীরা ছিল ঐক্যবদ্ধ। এই সংগ্রামে যাঁদের বীরত্বে দিকু ও ইংরেজরা ভীত হয়ে পড়েছিল— সেই তিলকা, সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরবের কথা সাহিত্যজগতে প্রায় অচর্চিত ছিল।

এছাড়াও সাঁওতালসহ অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সহানুভূতি ও মমত্ববোধ সম্পর্কেও সুশীল সমাজের অধিকাংশই ছিল অজ্ঞাত। সাঁওতাল, মুণ্ডা, পাহাড়িয়া প্রভৃতি জনজাতির অজানা জীবন ও বাস্তবতাকে তাঁর কথাসাহিত্যে তুলে ধরে মহাশ্বেতা দেবী তা এক বৃহৎ পাঠকসমাজের কাছে পৌঁছে দেন।

প্রাক-আর্য যুগ থেকেই বর্তমান বাংলা, বিহার, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডসহ ভারতের বিভিন্ন পাহাড়ি ও অরণ্যাঞ্চলে আদিবাসীদের বসবাস রয়েছে। 'আদিবাসী' বলতে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের আদি বাসিন্দাদের বোঝায়। নানা অভাব-অনটনের মধ্যেও আদিবাসীরা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য, সামাজিক রীতিনীতি, পরিকাঠামো, শাসনব্যবস্থা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল। তারা সাধারণত নির্দিষ্ট অঞ্চলে জোটবদ্ধভাবে বসবাস করে।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আদিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর বিখ্যাত 'শালগিরার ডাকে' উপন্যাসে সাঁওতাল, পাহাড়িয়া ও মালপাহাড়িয়া জনজাতির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি তাদের বাসস্থান সম্পর্কে বলেছেন যে, এরা ভাগীরথীর পশ্চিম প্রান্তে রাজমহল থেকে হাজারীবাগ ও মুঙ্গের পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে, উত্তরে ভাগলপুর থেকে দক্ষিণে রাঢ়বঙ্গের বীরভূম, বর্ধমান ও বাঁকুড়া এবং পশ্চিমে মেদিনীপুর থেকে ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ পর্যন্ত বন-জঙ্গল ও পাহাড়ি এলাকায় বসবাস করে।

ভারতের আদিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাঁওতালরা জঙ্গলের গাছ কেটে উঁচু-নিচু জমিকে চাষযোগ্য করে ধান, ডাল, সর্ষে ইত্যাদি চাষ করে। অন্যদিকে পাহাড়িয়া ও মালপাহাড়িয়ারা জঙ্গলে আগুন জ্বালিয়ে জুম চাষের মাধ্যমে কৃষিকাজ করে। রাত্রিকালীন অরণ্যের গভীর অন্ধকার দূর করতে তারা মহুয়া তেলের প্রদীপ ব্যবহার করে, যা তাদের প্রধান আলোর উৎস।

প্রাচীনকাল থেকেই তারা তথাকথিত সভ্য সমাজের বাইরে প্রান্তিক জীবনযাপন করে আসছে। সভ্য সমাজের কাছে তারা নিম্নবর্গ বা প্রান্তিক বলে বিবেচিত হলেও, তারা নিজেদের রীতিনীতি ও শাসনব্যবস্থার প্রতি অত্যন্ত অনুগত ছিল। সাঁওতাল সমাজে গ্রামের প্রধান 'মাঝি বাবা'-র নির্দেশ ছাড়া কোনো কাজ করা হতো না। এই শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাত্রার কারণেই তারা ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করতে সক্ষম হয়েছে।

মহাশ্বেতা দেবীর মতে, এই আদিবাসীরা সবসময় তথাকথিত সভ্য 'দিকু' সমাজ থেকে দূরত্ব বজায় রাখত। কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় সামগ্রী— যেমন লবণ, কার্পাস বা নারীদের সাজসজ্জার জিনিসপত্র—কেনার জন্য গ্রামের

পুরুষেরা দূরের হাটে যেত। বাড়ির মহিলারা কার্পাসের সুতো দিয়ে নিজেদের কাপড় বুনে নিত। এভাবেই তারা দিকু সমাজের সঙ্গে সীমিত যোগাযোগ রেখে নিজেদের স্বতন্ত্র জীবনধারা বজায় রাখত। অন্যদিকে 'দিকু' বা অ-আদিবাসীরাও তাদের নিম্নজাত বা অসভ্য মনে করে সংস্পর্শ এড়িয়ে চলত। ফলে অরণ্যবাসী এই আদিবাসীরা বাইরের জগতের পরিস্থিতি সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই অজ্ঞাত রয়ে যেত। তাই মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'শালগিরার ডাকে' উপন্যাসের শুরুতেই বলেছেন,

> "১৭৫০ সালে দেশের অবস্থা কেমন ছিল তার কিছু জানত না ভাগলপুর থেকে রাজমহল অবধি জঙ্গল এলাকার মানুষরা। তারা সাঁওতাল, তারা পাহাড়িয়া, তারা মালপাহাড়িয়া।... তখনো সাঁওতাল পরগণা, দামিন-ই-কোহ নামগুলি অজানা। বর্গী ফৌজের বারবার হানাদারিতে বিপর্যস্ত বাংলা সুবা। কিন্তু কে তার খবর রাখে? সাঁওতালরা রাখত না, পাহাড়িয়ারা রাখত না, মালপাহাড়িয়ারা রাখত না।"[১]

ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসীদের জীবনচর্যা উল্লেখ করতে গিয়ে বারবার বলেছেন, তারা মূলত নিজস্ব সমাজকেন্দ্রিক জীবনযাপন করে। তাদের মধ্যে বাহ্যিক লোভ, লালসা বা রাজনৈতিক অভিসন্ধি নেই। তারা নিজেদের সামাজিক পরিকাঠামো ও শাসনব্যবস্থাকে মান্যতা দিয়েই জীবনযাপন করে। তাই তারা সমাজের নিয়মের বাইরে যেতে চায় না। সাঁওতালদের কাছে গ্রামের মোড়ল বা মাঝি বাবা সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। উপন্যাসটিতে সাঁওতাল গ্রামের মোড়ল হলেন সুন্দ্রার বাবা। গ্রামের মোড়লের দায়িত্ব হলো গ্রামের নিয়ম-শৃঙ্খলা, রীতিনীতি ও সংস্কৃতি রক্ষা করা এবং প্রতিটি পরিবারের উন্নয়ন ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা। নিজ গ্রামের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি, গ্রামবাসীরা যাতে অন্য গ্রামের নিয়ম-শৃঙ্খলায় ব্যাঘাত না ঘটায়, সেদিকেও তারা নজর রাখে। ঘটনাক্রমে এমন কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে, প্রতিবেশী আদিবাসী গ্রামের মোড়লদের সঙ্গে 'কুলহি দুড়ুপ' বা আলোচনা সভা ডেকে সমস্যার সমাধান করা হয়। মোড়লদের কাছে জাতপাতের চেয়ে দোষ-গুণের বিচারই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই পাহাড়ের গায়ে থাকা পাহাড়িয়া আর মালপাহাড়িয়াদের শীতের মাঘী অমাবসায় পরব চলাকালীন সুন্দ্রার মালপাহাড়িয়া গ্রামে যাওয়ার খবর শুনেই গ্রামের মোড়ল তথা সুন্দ্রার বাবা সুন্দ্রাকে ধমক দিয়েছিল,

> "... মালপাহাড়িয়ারা পরব করছে নিজের মনে। গাঁয়ে সবাই ভাল থাকবে, তাতে গাঁওলি সাত বোন দেবতার পূজা করছে। আমাদের আখন পরব, সারজোম বাহা পরবে তারা আসে? নিজের মনে পরব পূজা করবে মানুষ, তুই অমনি কাঁড় ধনুক নিয়ে সেথা হাজির। যে যার গোতে থাকে, পরবে থাকে, গাঁয়ে থাকে, পরবে দোষও লেগে যায় বা-বাতাসে—এমন কাজ করতে নাই।"[২]

ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী শুরুতেই বলেছেন, সাঁওতালরা কৃষিকাজ করে। কিন্তু কৃষিকাজে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি— যেমন নাহেল (লাঙ্গল), কুডি (কোদাল), টাংগা (কুড়াল)— মেরামত করার দক্ষতা তাদের ছিল না। তাই চাষের কাজে ব্যাঘাত দূর করার উদ্দেশ্যে সাঁওতালরা গ্রামের এক প্রান্তে বসত জমি দিয়ে, ধান, চাল, চিড়ে, মুড়ি প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান করে এক কামার পরিবারের বসবাসের ব্যবস্থা করে। দরিদ্র কামার পরিবারটি অন্যত্র যে পারিশ্রমিক পেত, তার তুলনায় অনেক বেশি অবহেলিত হতো। কিন্তু সাঁওতাল গ্রামে তারা বসত জমি, ধান, চাল, চিড়ে, মুড়ি, গোরু ইত্যাদি সাংসারিক সামগ্রীর পাশাপাশি বিশেষ সম্মানও পায়। এই পরিস্থিতি দেখে দিনমণি কামার বিস্মিত হয়। সে তার ভাই রতনমণিকে বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করে,

> "জাতপাত নেই, এরা কি মানুষ?"[৩]

এই তথাকথিত 'অসভ্য' সাঁওতাল সমাজ যে অ-আদিবাসী কর্মকারদের আশ্রয়দাতা হয়ে উঠেছে, তার প্রমাণ মেলে দিনমণির ভাই রতনমণির উক্তিতে—

> "জাতপাতে কি করে? না জেনে মুচির অন্ন খেলাম, তা বলে বিপদে পড়লে নিয়ম খাটে না। তাতে অমন লাঞ্ছনা করল? ধান পাচ্ছ, চাল পাচ্ছ, ডোল ভরা চিড়ে, মুড়ি, জীবনে এত দেখেছ?"[৪]

সাঁওতালরা শুধু অ-আদিবাসীদের আশ্রয়ই দেয়নি, তাদের সঙ্গে কুটুম্ব বা আত্মীয়ের মতো আচরণ করেছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় দিনমণি ও রতনমণির স্ত্রীর কথায়—

> "কামার, সে লোহার কাজ করে। তীরের ফলা, বর্শা, সড়কির ফলা। কোদাল, কুড়াল, কাস্তে, দা, নিড়ানি। এমন দরকারের কাজ যে করে তার সম্মান কত। দুধ, মাছ, দই, মাংস, যার যার ঘরের জিনিস এনে দিয়ে যায়। জমিতে লাউ, কুমড়ো, বেগুন, কচু, লঙ্কা আছে নাও। গরু রাখতে চাও, রাখো। ধানের জমি? সেও ওরাই পালা করে শ্রম দিতে যায় মেয়ে-পুরুষ। এত সুখ পায় কে?"[৫]

উপন্যাসে দেখা যায়, সাঁওতালরা নিজেদের গ্রামকে স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভর করে তুলতে বিভিন্ন পেশার মানুষকে গ্রামে বসবাসের অনুমতি দেয়। এর ফলে গ্রামের এক প্রান্তে দরিদ্র নাপিত, ছুতোর, ধোপা, কুমোরসহ নানা পেশার মানুষের বসতি গড়ে ওঠে এবং তাদের প্রয়োজনীয় সুবিধাও প্রদান করা হয়। এতে সাঁওতালদের অ-আদিবাসী 'দিকু' গ্রামের উপর নির্ভরশীলতা যেমন কমে, তেমনি অ-আদিবাসী বিভিন্ন পেশার মানুষও সাঁওতাল গ্রামে আশ্রয় নিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ফলে আদিবাসীরা অ-আদিবাসীদের আশ্রয়দাতায় পরিণত হয়। আজও বহু বড় সাঁওতাল গ্রামের এক প্রান্তে কামারশালা দেখা যায়।

মহাশ্বেতা দেবী এই উপন্যাসে এমন এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন, যা বাংলার সামগ্রিক সামাজিক কাঠামোকে আমূল পরিবর্তন করেছিল। যে সময়ে সমাজের সামাজিক পরিকাঠামো ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল, সেই বর্গী আক্রমণের প্রেক্ষাপটে তিনি দেখিয়েছেন— কীভাবে আদিবাসীদের উপর অ-আদিবাসী 'দিকু'রা নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং তাদের আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়। এই বিষয়টি 'শালগিরার ডাকে' উপন্যাসে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

বর্গী বলতে মারাঠা রাজার নেতৃত্বাধীন অশ্বারোহী লুটেরাদের দলকে বোঝায়। 'বর্গী' শব্দটি মারাঠি 'বারগির' শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ নিয়োগকর্তার দেওয়া ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করা বিশেষ ধরনের সৈনিক। আনুমানিক ১৭৪২ থেকে ১৭৫১ সাল পর্যন্ত প্রায় দশ বছর ধরে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে তারা অত্যাচার, লুটপাট, গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া এবং হত্যাযজ্ঞ চালায়। বাংলায় এই বর্গী আক্রমণের প্রভাব এতটাই গভীর ছিল যে, এর ভয়াবহ স্মৃতি লোকছড়ার আকারে আজও প্রচলিত— "বর্গী এলো দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেবো কিসে?" এই বর্গী দল বাংলার জমিদার ও নবাবদের ধনসম্পদ লুঠ করার উদ্দেশ্যে সুদূর পথ অতিক্রম করে আসত। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'শালগিরার ডাকে' উপন্যাসে দেখিয়েছেন, বর্গীরা মুর্শিদাবাদ লুঠ করতে এসেছিল। তারা মুর্শিদাবাদসহ বিভিন্ন স্থানে ধান লুঠ, অগ্নিসংযোগ এবং নারীদের উপর নির্মম নির্যাতনের মতো অমানবিক অত্যাচার চালায়। বর্গীদের এই অত্যাচার থেকে বাঁচতে সাধারণ মানুষ গ্রাম ছেড়ে পালাতে থাকে। অনেকে ভাগীরথী ও পদ্মা নদী পেরিয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে পালিয়ে যায়, কারণ বর্গীরা অশ্বারোহী হওয়ায় তারা সাধারণত ঘোড়া থেকে নামত না।

মহাশ্বেতা দেবী কবিতার আকারে এই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন—

"গন্ধবণিক পলায় দোকান লইয়া যত।
তামা পিতল লইয়া কাঁসারি
পলায় কত।
কামার কুমার পলায় লইয়া চাক নড়ি
জাউলা মাউছা পলায় লইয়া
জাল দড়ি॥
ছোট বড় গ্রামে যত লোক ছিল
বরগির ভয়ে সব পলাইল।
চাইর দিগে লোক পলায় ঠাঁই ঠাঁই।
ছত্রিশ বর্ণের লোক পলায় তার অন্ত
নাই।।"[৬]

ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন, বর্গীদের অত্যাচারের ফলে ছত্রিশ বর্ণের মানুষ স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয়। মূলত নিজেদের গ্রামে বর্গী আক্রমণের কারণেই তারা পালাতে বাধ্য হয়েছিল। তবে কিছু পরিবার নদী পেরিয়ে পালাতে পারেনি; তারা আশ্রয় নেয় জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত আদিবাসী সাঁওতাল গ্রামগুলোতে। এর প্রধান কারণ ছিল, আদিবাসীরা তীর-ধনুক হাতে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম। তাদের মধ্যে জাতপাতহীন একতা ছিল, যা অন্যায় অত্যাচার প্রতিরোধে যথেষ্ট কার্যকর। ফলে বর্গী আক্রমণ ও জাতপাতের বৈষম্য থেকে বাঁচতে বহু 'দিকু' সম্প্রদায় সাঁওতাল গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু বর্গী আক্রমণ দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকায় কামার, কুমোর, ছুতোর, তেলি প্রভৃতি পেশার বহু মানুষ সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। আদিবাসীরা সাধারণত অ-আদিবাসীদের নিজেদের গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে দিত না; তবে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানবিকতার খাতিরে তাদের আশ্রয় দেয়। এই অ-আদিবাসীরা শুধু আশ্রয়ই গ্রহণ করেনি, বরং সাঁওতালদের কাছ থেকে নানা সুযোগ-সুবিধাও পেতে থাকে। মহাশ্বেতা দেবী আশ্রয়গ্রহীতাদের উদ্দেশ্যে আদিবাসী সাঁওতালদের বিশেষ শর্তের কথা বলেছেন—

> "বর্গীর হাঙ্গামা চলতে চলতেই জঙ্গল এলাকার গ্রামগুলিতে এল বাইরে থেকে অন্য সমাজ। এসো থাকো, জমি হাসিল কর কিছু। কিন্তু গ্রামে গ্রামে আমাদের সমাজপতিদের শাসন মানতে হবে। বেইমানি নয়, বিবাদ নয়, মিথ্যা কথা নয়।"[৭]

বর্গী আক্রমণের ফলে সহায়-সম্বলহীন অসহায় কামার, কুমোর, ছুতোরসহ অন্যান্য 'দিকু'রা আদিবাসী গ্রামকেই সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় বলে মনে করে। বর্গীরা সাধারণত আদিবাসী গ্রামে আক্রমণ চালাতে সাহস পেত না; ফলে দিকুরা বর্গী আক্রমণের বিপদ থেকে রক্ষা পায়। পাশাপাশি আদিবাসী গ্রামে বসবাসের ফলে তারা খামারে ধান, গোয়ালে গরু প্রভৃতি সুবিধাও লাভ করে— যা মূলত সাঁওতালদের দেওয়া।

আদিবাসী সাঁওতালরা কোনো জমিদার বা সুবাদারকে কর প্রদান করত না; বরং জমিদার ও সুবাদাররাই দুর্গাপুজোর সময় সাঁওতালদের ফল, মিষ্টান্ন, কাপড়, পাগড়ি ইত্যাদি উপহার পাঠিয়ে সম্মান জানাত। রাজা ও জমিদারেরাও সাঁওতালদের বীরত্ব ও ঐক্যবদ্ধতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল এবং তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখত। তাই করমুক্ত ও অত্যাচারমুক্ত এই অঞ্চল উদ্বাস্তু দিকুদের কাছে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে।

আদিবাসীরা, বিশেষ করে সাঁওতালরা, সাধারণত সহজ-সরল প্রকৃতির এবং অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ায়। তারা সহজেই মানুষকে বিশ্বাস করে, ফলে অচেনা দিকুদেরও নিজেদের গ্রামে আশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু পাহাড়িয়ারা নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভেবে অচেনা কাউকে আশ্রয় দিত না। তারা মিথ্যা ও বিশ্বাসঘাতকতা

সহ্য করতে পারত না। তাই তাদের গ্রামে অপরিচিত দিনমণির অনুপ্রবেশকে প্রথমে ক্ষমা করলেও, তার বিশ্বাসঘাতকতাকে ক্ষমা করেনি; বর্গীদের সঙ্গে অর্থের বিনিময়ে সহযোগিতার কথা জানতে পেরে তারা তাকে হত্যা করে। তাদের কাছে গ্রামের নিরাপত্তাই সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যদিকে, সাঁওতালদের কাছেও গ্রামের সুরক্ষা সর্বোপরি হলেও তারা মানসিকভাবে অত্যন্ত সহজ, সরল ও উদার। এই কারণেই তারা অসহায় দিকুদের আশ্রয়দাতা হয়ে ওঠে। তারা দিকুদের নবান্ন, পৌষ পার্বণ, মনসা পূজার মতো উৎসব গ্রামে পালনের অনুমতি দেয় এবং নিজেরাও সেইসব উৎসবে অংশগ্রহণ করে। এর ফলে ধীরে ধীরে সাঁওতাল গ্রামের সামাজিক পরিকাঠামো পরিবর্তিত হতে শুরু করে।

মহাশ্বেতা দেবী এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন, সাঁওতালরা তথাকথিত 'অসভ্য' হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা অত্যন্ত উদার। কিন্তু এই সহজ-সরল উদারতার সুযোগ নিয়েই পরবর্তীতে সাঁওতাল গ্রামে দিকুদের আধিপত্য বিস্তার ঘটে এবং ধীরে ধীরে সাঁওতালদের ওপর শাসন, শোষণ ও অত্যাচার শুরু হয়। দিনমণির মতো কিছু আশ্রয়গ্রহীতা অর্থলোভে জমিদার, সুবাদার ও মহাজনদের সাঁওতাল গ্রামে প্রবেশ ও শাসন প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেয়। এর ফলে সাঁওতালরা অতিরিক্ত করের বোঝায় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের ওপর নির্মম শাসন ও শোষণ চলতে থাকে। একসময় যাদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল, সেই দিকুদেরই একটি অংশ অর্থলোভে সাঁওতালদের ভিটেমাটি ছাড়া করতে উদ্যোগী হয়। এরই পরিণতিতে বিক্ষুব্ধ সাঁওতালরা সুন্দ্রা মুরমুর বীর সন্তান তিলকা মুরমু (তিলকা মাঝি)-এর নেতৃত্বে দিকু ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রথম গণবিদ্রোহ সংঘটিত করে।

মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যকর্ম, বিশেষ করে 'শালগিরার ডাকে', আমাদের কাছে আদিবাসী সমাজের জীবন, সংগ্রাম ও সংস্কৃতিকে জীবন্তভাবে তুলে ধরেছে। তিনি দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন ও প্রান্তিক হলেও আদিবাসীরা— বিশেষ করে সাঁওতাল, পাহাড়িয়া ও মালপাহাড়িয়া— নিজেদের সমাজকেন্দ্রিক, ঐক্যবদ্ধ ও নৈতিক জীবনে অটল। বর্গী আক্রমণ, দিকু সমাজের প্রভাব, ব্রিটিশ শাসনকালীন অবক্ষয় ও অন্যান্য রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও তারা নিজেদের সংস্কৃতি, সামাজিক নিয়মকানুন, শৃঙ্খলা এবং স্বশাসন রক্ষা করতে সচেষ্ট ছিল। এই উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী দেখিয়েছেন যে, আদিবাসীরা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের জন্য নয়, বরং তাদের পুরো সমাজকে রক্ষা করতে ঐক্যবদ্ধ ছিল।

উপন্যাসে বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, সাঁওতালরা অ-আদিবাসীদের আশ্রয়দাতা হিসেবে মানবিকতা ও উদারতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বর্গী আক্রমণের সময় অসহায় ও নিরাপত্তাহীন দিকু বা অ-আদিবাসীরা তাদের গ্রামে আশ্রয় নেয়। সাঁওতালরা কেবল আশ্রয়ই দেয়নি, বরং খাদ্য, বাসস্থান এবং গ্রামসমাজে অংশগ্রহণের সুযোগও প্রদান করেছে। তারা সামাজিক নিয়ম মেনে চলার শর্তে এই আশ্রয় প্রদান করত, ফলে বিপদের সময় অ-আদিবাসীরা তাদের নির্ভরশীল হয়ে উঠতে বাধ্য হয়। এই প্রক্রিয়ায় সাঁওতালরা মানবিকতা, উদারতা এবং সমাজকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক হিসেবে প্রকাশ পায়। এছাড়া, গ্রামের সুরক্ষা ও ঐক্য রক্ষার জন্য তারা প্রতিটি পরিবারের এবং গ্রামের স্বার্থকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করত। ফলে, সাঁওতালরা তাদের নিজস্ব শক্তিশালী সামাজিক কাঠামো বজায় রেখে বিপদাপন্ন অসহায়দের রক্ষা করত এবং সমাজে ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা করত।

মহাশ্বেতা দেবী শুধু আদিবাসীদের সংগ্রাম এবং বীরত্বের ইতিহাস উদ্ভাসিত করেননি, বরং সাধারণ পাঠককে দেখিয়েছেন কিভাবে তারা মানবিক সহমর্মিতা, উদারতা, এবং আত্মনির্ভরতার মাধ্যমে সমাজের ক্রমবিকৃত পরিস্থিতিতেও স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। তিনি তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, এবং সামাজিক বন্ধনকে

জীবন্তভাবে তুলে ধরেছেন, যা ইতিহাস ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছে। মহাশ্বেতা দেবীর লেখা কেবল আদিবাসীদের জীবনচর্যার চিত্রায়ন নয়, বরং তাদের ঐক্য, সংগ্রাম, ন্যায়পরায়ণতা এবং বিপদের সময় অসহায়দের আশ্রয়দানের মানবিকতাকেও প্রতিফলিত করে। এটি বাংলা কথাসাহিত্যে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, যা সামাজিক সচেতনতা, নৈতিকতা এবং মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্ব পাঠকসমাজের কাছে প্রতিস্থাপন করেছে। আদিবাসীদের এই আত্মনির্ভরশীল এবং মানবিক চরিত্র সমাজ ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে চিরন্তন শিক্ষার উৎস হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র:

১। দেবী, মহাশ্বেতা। শালগিরার ডাকে। করুণা প্রকাশনী, অগ্রহায়ণ ১৩৪১, পৃ. ১।
২। তদেব, পৃ. ২।
৩। তদেব, পৃ. ৫।
৪। তদেব, পৃ. ৫।
৫। তদেব, পৃ. ৫।
৬। তদেব, পৃ. ১৪।
৭। তদেব, পৃ. ১৫।